পাঠকের মতামত

যুদ্ধ চাই

মান থাকে না, চালাও কামান
বিমান হানাও দরকারি,
মরে মরুক পড়ুক লাশ
আদেশ যখন সরকারি।

সীমান্তে দুই দেশপ্রেমিক
যুদ্ধযুদ্ধতাদের বাই,
বোকায় বলে 'মারিস কারে
হতে পারে তোরই ভাই।

সরকারি কান শুনতে না পায়
যুদ্ধবাজার চাঙ্গা যে,
আর দেরি নয় নাই সংশয়
শত্রু নিধন আন্দাজে।

কেউ বা বলে ভাবছো কী হে,
কেমন তুমি বেআক্কেল?
বাজার এখন গরমাগরম
চালাও লড়াই সার্জিকাল।

পাড়ার মোড়ে হাত পা নেড়ে
কে যেন রে যুদ্ধ চায়?
বুদ্ধঅশোক শোকে পাথর
আমজনতা লজ্জা পায়।

নুন আনতে পান্তা ফুরায়
তারও বড় যুদ্ধেসুখ
যুদ্ধ এখন পথে ঘাটে
যুদ্ধএখন সর্বভুক।

ভোট মরশুম চলবে নিঝুম
হামলা যখন সীমান্তে
কোলের ছেলে আস্তে কাঁদিস
ভাত জোটে না দিনান্তে।

নেতায় নেতায় ভরবে উঠান
পরবে মালা বীর শহিদ,
যুদ্ধবড় দরকারি ভাই
পুঁজিবাদের শক্ত ভীত।

দেশপ্রেমের বইছে বাতাস
আসছে বুঝি আচ্ছে দিন
বাড়ুক বেকার থাক হাহাকার,
যুদ্ধ রঙে সব রঙিন।

দয়াময় ব্যানার্জী
রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া

ভারাক্রান্ত মনে শীতল বাতাস

৩ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক আবহ খুবই সরগরম ছিল। বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেল মাল্টি ক্যাম সম্প্রচার চলছে-'বামফ্রন্টের বিগ্রেড'। বিগ্রেডে কত লোক আসছে? কীভাবে আসছে? বিগ্রেডের কোন জায়গটা ফাঁকা পড়ে আছে? কীভাবে সেই শূন্যস্থান পূরণ হবে! তার বিস্তারিত বিবরণ শুনলেন রাজ্যবাসী। নির্ধারিত নয়জন বক্তার প্রত্যেকেই প্রায় এক সুরে 'বিকল্পে'র কথা বলে গেলেন, বললেন 'বিকল্প নীতি' বাস্তবায়নের কথা, কিন্তু কী সেই 'বিকল্প নীতি'? সেই নীতির অভিমুখটাই বা কী? এর কোনও স্পষ্ট উত্তর সেদিন পাইনি, বরং আর পাঁচটা সংসদীয় দলের মতোই নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য যেভাবে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়-তাই-ই সেদিন দিয়েছেন নেতারা। ফলে প্রাপ্তির ভাঁড়ার শূন্য থেকেছে বেশিরভাগ বাম মনোভাবাপন্ন মানুষের। এই নিয়ে মন যখন ভারাক্রান্ত, মনে একটু শীতল বাতাস দিয়ে গেল গণদাবী'র (৭১/২৭) সংখ্যায় মুদ্রিত একটি নিবন্ধ 'কোন বিকল্পের কথা বলছেন কমরেড'! এই নিবন্ধটিতে খুব যথোচিতভাবে সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন তোলা হয়েছে..."দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় বামফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সরকার চালিয়েছে। রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি কোন ক্ষেত্রে কী বিকল্পের তারা চর্চা করেছিলেন? পশ্চিমবঙ্গ কে কোন বিকল্পের সন্ধান তাঁরা দিয়েছিলেন? এখন যদি তাঁরা সরকার গঠনের আওয়াজ তুলে বিকল্পের কথা বলেন, তবে তো প্রশ্ন উঠবেই। 'গণদাবী' খুব সঠিকভাবেই জনসাধারণের মতকে প্রতিফলিত করছে এই নিবন্ধে যে "...এখন এই রাজ্যের মানুষ হিসাব করে, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে কে এগিয়ে বামফ্রন্ট না তৃণমূল? কুকর্মে কে কম বা কে বেশি?" এই বক্তব্যের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ সৎ বামপন্থীরাও সহমত যে, "...ক্ষমতাসীন এক সরকারকে হঠিয়ে বামপন্থীরা বেশি আসন দখল করলেই বামপন্থার জয়? এই রাজনীতির চর্চা করে বামপন্থার অনেক সর্বনাশ করেছেন কমরেড, এবার থামুন। ভোটসর্বস্ব রাজনীতি করছেন করুন—দোহাই, তাকে বামপন্থা বলবেন না।"

নিবন্ধের মর্মবস্তুকে উপলব্ধি করলে যে সরল সত্যটি প্রস্ফূটিত হয় তা হল বামপন্থাকে নিছক ভোটের বিকল্প না বানিয়ে সংগ্রামী বামপন্থার ঝান্ডাকে উর্ধ্বে তুলে ধরাটাই আজ কর্তব্য।

সৌপ্তিক পাল
কলকাতা

মাধ্যমিকে ছাত্র সংখ্যা কমার দায় সরকারি নীতির

এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ১৮ হাজার কম। কারণ হিসাবে জন্মহার কমে যাওয়ার কথা বলেছেন মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি। এর সাথে তিনি আরও একটা অদ্ভুত কথা বলেছেন, যেহেতু পাশের হার বাড়ছে, সে-কারণেও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে। প্রসঙ্গত ২০১৭ সালেও তার আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৭৫ হাজার পরীক্ষার্থী কম ছিল।

সরকারি তথ্যই কিন্তু তাঁর কথার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। ২০০৯ সালে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল প্রায় ২৬ লক্ষ শিক্ষার্থী। ২০১৯-এ মাধ্যমিকে বসছে সাড়ে ১০ লক্ষের একটু বেশি। শুধু তাই নয়, এই ২৬ লক্ষের মধ্যে পঞ্চম শ্রেণিতেই উঠেছিল মাত্র ১৬ লক্ষের কিছু বেশি। অর্থাৎ পাশ-ফেল না থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক স্তরেই ড্রপআউট হয়েছে প্রায় ১০ লক্ষ। বাকি ৫ লক্ষের বেশি শিক্ষার্থী স্কুল ছেড়েছে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির মধ্যে। এমনটা ঘটল কি জন্মহার কমার কারণে?

পর্ষদ সভাপতি জন্মহার হ্রাসের যে-কথা বলেছেন সেই কথারই বা ভিত্তি কী? ২০১১-র সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ২০০১ সালে রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল ৮.০২ কোটি এবং ২০১১ সালে তা হয়েছে ৯.১৩ কোটি। তাহলে জন্মহার কমার কথাটা আসছে কোত্থেকে? মাধ্যমিক পর্ষদ সভাপতির মতো পদে যিনি আছেন, তাঁর কথার একটা ভিত্তি থাকতে হবে তো!

দ্বিতীয়ত, গত বছর পাশের হার বৃদ্ধির সাথে এবছর পরীক্ষার্থী কমার সম্পর্ক প্রমাণ করতে হলে সভাপতিকে স্পষ্ট তথ্য পেশ করতে হত। তাও তিনি করেননি।

কেন মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ পরীক্ষার্থী কমার কারণ হিসাবে এরকম ভিত্তিহীন মন্তব্যের আশ্রয় নিলেন? স্বভাবতই, প্রকৃত কারণটা গোপন করার জন্য। বস্তুত, শিক্ষাব্যবস্থার পরিকাঠামোর চরম বেহাল দশা, জনগণের প্রবল দারিদ্র ইত্যাদির সাথে পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার ফলে আরও বিপুল হারে বাড়ছে স্কুলছুটের সংখ্যা। এই কারণেই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে। এই সমস্যাকে সমাধানের উদ্যোগ না নিয়ে, তাকে আড়াল করলে কার ক্ষতি, রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদেরই নয় কি? কিন্তু এ কথা ভাবলে তাঁর চলবে কেন? সরকারি দলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং কর্তাভজা হওয়াটাই আজ এই রাজ্যে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা প্রশাসনের মাথায় বসার যোগ্যতার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাধ্যমিক পর্ষদ সভাপতি তার অন্যথা করার ঝুঁকি নেবেন কী করে? সিপিএম সরকারের আমল থেকেই এ রাজ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে রোগ চেপে বসেছে তার নাম দলবাজি আর স্বজন পোষণ। তৃণমূল সরকারও সেই ধারাই বজায় রেখেছে। সে রোগে দুর্বল না হয়ে শিক্ষার ভাল চাইলে, পর্ষদ সভাপতিকেও সর্বনাশা সরকারি নীতির বিরোধিতাই করতে হবে।

মাটি চাপা পড়ে ছাত্রী-মৃত্যু
দোষীদের শাস্তির দাবি

১৭ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের ব্লকের দ্বারকেশ্বর নদী ঘেঁষা আখড়াশোল গ্রামের হতদরিদ্র মেটে পাড়ায় রাস্তার পাশে ঠিকাদারের খোঁড়া গভীর গর্তে মাটি ধসে ৫ জন স্কুল ছাত্রী চাপা পড়লে গ্রামের লোকজন তৎপরতার সাথে উদ্ধার কাজে নামেন। কিন্তু ঘটনাস্থলেই ৩ জনের মৃত্যু ঘটে। গুরুতর আহত দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এসইউসিআই(সি)-র জেলা কমিটির সদস্য স্বপন নাগ সহ কমরেড হরিপদ সরেন, কমরেড ধূমল সরেন ঘটনাস্থলে গিয়ে শোকার্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ান এবং গভীর সহানুভূতি জানান। হাসপাতালে আহত ছাত্রীদের যাতে সুচিকিৎসা হয় সে জন্য চিকিৎসকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। পার্টির পক্ষ থেকে পাত্রসায়ের ব্লকে বিডিও এবং বাঁকুড়া জেলাশাসকের কাছে ২১ ফেব্রুয়ারি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

দুই ছাত্রীর মৃত্যুর তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ঠিকাদারকে কঠোর শাস্তি, দুর্ঘটনাগ্রস্ত অতি গরিব খেতমজুর পরিবারগুলিকে ১৩ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ও প্রতি পরিবারে স্থায়ী চাকরি, চিকিৎসাধীন ছাত্রীদের গুরুত্ব সহকারে চিকিৎসা, মেটে পাড়ার গভীর গর্তের নালাকে অবিলম্বে ভরাট প্রভৃতি দাবিতে পাত্রসায়ের ব্লকে ডেপুটেশন দেন কমরেডস স্বপন নাগ, ধূমল সরেন ও হরিপদ সরেন। বিডিও প্রতিনিধিদের বলেন, আপনারাই এই দাবিগুলি তুললেন। তিনি অতি দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থার আশ্বাস দেন। জেলাশসকের কাছে স্মারকলিপি দেন কমরেডস স্বপন নাগ, শিশির কোলে ও হরিদাস ব্যানার্জী।

কার্পেট কারখানায় মৃত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ও তদন্তের দাবি

উত্তরপ্রদেশের ভাদোহি জেলার চৌরিতে কার্পেট কারখানায় বিস্ফোরণে মালদা জেলার নয় শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। দলের মালদা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে মানিকচক থানার এনায়েতপুর গ্রামের মৃত শ্রমিকদের পরিবারগুলোর সাথে সাক্ষাৎ করে সমবেদনা জানানো হয়। জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম সরকারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ২৪ ফেব্রুয়ারি মালদা জেলাশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি দেন। তাতে মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে ন্যূনতম ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ, মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে কঠোর শাস্তি এবং রাজ্যে সমস্ত শ্রমিকদের কাজ পাওয়ার মতো উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে ন্যায্য মজুরিতে কাজের ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়।

সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের সভা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী ও পেনশনারদের জন্য হেলথ স্কিম চালু হয়েছে ২০০৮ সালে। বর্তমান সরকারের আমলে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এই স্কিমে চিকিৎসা খরচ পেতে কর্মচারী পেনশনারদের নানা অপ্রত্যাশিত সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

এই বিষয়ে ২২ ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য ভবনের কনফারেন্স হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারি ইউনিয়ন এক সভার আয়োজন করে। উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম অথরিটির প্রথম কনভেনর মেম্বার মহম্মদ জহিরুদ্দিন মোল্লা। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক শুভাশীষ দাস ও কলকাতা জেলা সম্পাদক সন্তোষ মহন্ত। বক্তারা বলেন, চিকিৎসা খরচ পেতে ৩-৪ বছর লেগে যাচ্ছে, অথচ সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসা খরচ মিটিয়ে দেওয়ার সংস্থান স্কিমে আছে, চুক্তিবদ্ধ হাসপাতালগুলি চুক্তি অনুযায়ী পরিষেবা দিচ্ছে না বা ক্যাশলেস পরিষেবা দিচ্ছে না, ফলে কর্মচারীরা ক্ষতি ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন, স্কিম অনুযায়ী কর্মচারীদের সচেতন করার কথা সরকারেরই। সরকার সে দায়িত্ব পালন করছে না। বিষয়গুলি নিয়ে কর্মচারীদের সংগঠিতভাবে সরকারের কাছে দাবি করার আহ্বান জানানো হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে।

১৬ ফেব্রুয়ারি এলাকায় মদের দোকান বন্ধের দাবিতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মথুরাপুর থানার কৃষ্ণচন্দ্রপুরে রাস্তা অবরোধ করেন স্থানীয় অধিবাসীরা। অন্ধমুনিতলার মদের দোকান সহ এলাকার সমস্ত দোকান বন্ধ করার দাবি তোলা হয়। এই উপলক্ষে ওই দিনেই এলাকায় নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

বিবেকানন্দ ও দীনদয়াল

তিনের পাতার পর

দেখিয়া লেখক হিন্দু কি মুসলিম তাহা বলা অসম্ভব। দরাব খাঁর রচিত সংস্কৃত গঙ্গা স্তব তো অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেরও নিত্যপাঠ্য।"

"সেতার যন্ত্রটি হিন্দু-মুসলমান দুই যন্ত্রের সমন্বয়ে। এসরাজ, সুরবাহার, সারেঙ্গী প্রভৃতি হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার ফল। তবলাও তাই। রামপুরের নবাব কলব আলী খাঁ সুরশৃঙ্গার প্রবর্তন করেন।"

"হিন্দু মুসলমান উভয় সাধনাতেই রসিক ও প্রেমিকেরা পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা করিয়াছেন। কিন্তু যত বিপদ বাধাইয়াছেন ধর্ম-ব্যবসায়ীর দল। কবীর বলিয়াছেন, স্বয়ং ভগবানও ধর্ম-ব্যবসায়ীদের ভয় পান।" এই হল ভারতীয় সভ্যতার সত্যকার পরিচয়। এখানে, আর্য-অনার্য, শক-হূন-পাঠান-মোগল এসে এক দেহে লীন হয়েছে— সৃষ্টি হয়েছে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির। একইভাবে মধ্যযুগেও ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা এ দেশের সভ্যতা সংস্কৃতিকে পুষ্ট করেছে। গৌরবময় এই অধ্যায়কেই আধুনিক ধর্ম-ব্যবসায়ীরা অস্বীকার করেন, ইতিহাসকে বিকৃত করেন। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় নিজেকে এই আধুনিক ধর্ম-ব্যবসায়ীদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তায় পরিণত করেছিলেন এবং এইভাবে নবজাগরণের মূল প্রবাহের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন— ঐতিহাসিক এই সত্যকে কোনওমতেই অস্বীকার করা যাবে না। সুকৌশলে কেন্দ্রীয় সরকার স্বামী বিবেকানন্দের নামের সাথে পণ্ডিত দীনদয়ালের নাম জুড়ে দিয়েছে। পণ্ডিত দীনদয়ালের জন্মশতবার্ষিকীতেই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার ১২৫ বছর। এই দুটো উপলক্ষকে এক সাথে জুড়ে দিয়ে 'স্টুডেন্টস লিডার্স কনভেনশনে' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভাষণ দিয়েছেন এবং ইউ জি সি-কে বলা হয়েছে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় যেন এই বক্তৃতা শোনানোর ব্যবস্থা করে তা দেখতে। ইউ জি সি-ও তার ত্রুটি করেনি। তারা উপাচার্যদের নির্দেশ পাঠিয়েছে যেন উপযুক্ত জায়গায় টিভি বা প্রজেক্টর বসিয়ে অনুষ্ঠান শোনানোর ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র ও শিক্ষকের মনের মধ্যে বিবেকানন্দের পাশে দীনদয়ালকে বসিয়ে দেওয়ার সরকারি আয়োজন করা হয়েছে।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দীনদয়ালের ভূমিকা, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ও ঐক্য প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। আমরা দেখিয়েছি ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে তিনি অংশগ্রহণ করেননি, এমনকী ব্রিটিশ বিরোধিতাকে তিনি দেশপ্রেম বলেও মনে করতেন না। আবার মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসে ভরা। এই ধরনের একজন মানুষকে স্বামী বিবেকানন্দের সমকক্ষ তো দূরের কথা একজন সামান্য অনুগামীও বলা যায় না। চিন্তায়-কর্মে-আচার-আচরণে-লক্ষ্যে — সবদিক দিয়েই তিনি ছিলেন বিবেকানন্দ চিন্তার ঘোরতর বিরোধী। এ দেশে বহু বিপ্লবী কর্মী ছিলেন যাঁরা বিবেকানন্দ চিন্তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ বলেছেন, "ভারতমাতা, বন্দেমাতরম এবং স্বামী বিবেকানন্দ, এই তিনটি আমাদের মন্ত্র ছিল। এই তিনটি সত্যের পতাকা নিয়েই আমরা চলেছি— চলেছে বিনয়-বাদল-দীনেশ " (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, খণ্ড-৬, পৃ ঃ ১৬২)। চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস বিবেকানন্দ সম্পর্কে আবেগ ভরে লিখেছেন— "হি ইজ দ্য মরাল ফোর্স অফ ইন্ডিয়া"। দীনবন্ধু এন্ড্রুজ লিখছেন, "বিবেকানন্দ ইন্টারপিড প্যাট্রিয়টিজম গেভ এ নিউ কালার টু দ্য ন্যাশনাল মুভমেন্ট থ্রু আউট ইন্ডিয়া। দ্য মঙ্ক অ্যান্ড দ্য প্যাট্রিয়ট ওয়্যার কিউরিয়াসলি ব্লেন্ডেড ইন হিম।" (ওই, পৃ ঃ ৯৩)। হাসতে হাসতে যাঁরা ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেছেন তাঁদের প্রায় সবাই বিবেকানন্দের চিন্তা ও অমিত তেজের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। 'ভুলিও না জন্ম হইতেই তুমি মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত'— বিবেকানন্দের এই আহ্বান তাঁদের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে সর্বস্ব ত্যাগের শক্তি জুগিয়েছে।

পণ্ডিত দীনদয়াল যদি বিবেকানন্দ চিন্তার অনুগামী হতেন তা হলে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনার চর্চা তিনি করতেন এবং এক জাতি-এক প্রাণ-একতার চিন্তা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করত। কিন্তু কষ্টকঠিন সমস্যাসংকুল সেই পথে তিনি হাঁটেননি। পরাধীন যুগে ব্রিটিশের সাথে সংগ্রাম না করে তিনি ব্রিটিশকে বন্ধু হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। এই কারণে মুসলিম লিগ যেমন মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করে ব্যাপক মুসলিম জনতাকে জাতীয়তবাদী সংগ্রামের প্রবাহের বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, পণ্ডিত দীনদয়াল ও তাঁর সংগঠন আরএসএস-ও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার তত্ত্ব প্রচার করে ব্যাপক হিন্দু জনতাকে জাতীয়তাবাদের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছিল। বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে হয়েছিল, অন্ধ-যুক্তিহীন হিন্দু সাম্প্রদায়িক মানসিকতা সৃষ্টি করতে হয়েছিল।

বিবেকানন্দ নিজেকে 'হিন্দু' বলতে গর্ব অনুভব করতেন এ কথা ঠিক। কিন্তু তাঁর এই চিন্তার মর্মবস্তুতে ছিল জাতীয়তাবাদ। সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি ঘৃণা করতেন। রামকৃষ্ণের শিক্ষানুযায়ী তিনিও মনে করতেন— 'অসংখ্য নদী যেমন বিভিন্ন পর্বত থেকে বেরিয়ে এসে একই সমুদ্রে তাদের জলধারা মিশিয়ে দেয়, তেমনি বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভূত হয়ে' মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে। এই জন্য তিনি সকল ধর্মকেই সত্য বলে মনে করতেন, ধর্মীয় অনুদারতাকে ঘৃণা করতেন। বলতেন, "আগে ধার্মিক হও, দিবার মতো কিছু অর্জন কর, তারপর জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহা বিতরণ কর। ধর্ম বাক্যাড়ম্বর

এই কারণে মুসলিম লিগ যেমন মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করে ব্যাপক মুসলিম জনতাকে জাতীয়তবাদী সংগ্রামের প্রবাহের বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, পণ্ডিত দীনদয়াল ও তাঁর সংগঠন আরএসএস-ও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার তত্ত্ব প্রচার করে ব্যাপক হিন্দু জনতাকে জাতীয়তাবাদের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছিল।

নহে, মতবাদ বিশেষ নহে, অথবা সাম্প্রদায়িকতা নহে।" এই জন্য স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে ইসলাম বিদ্বেষ তো দূরের কথা, ইসলাম ধর্মের মহত্ব ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। হজরত মহম্মদের প্রতি তিনি বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তাই তাঁর মুখে আমরা শুনি, "বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্মপরিণত ইসলাম ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানব-সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। আমরা মানব জাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই— যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই, অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই ইহা করিতে হইবে। ...আমাদের নিজের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই— বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ একমাত্র আশা।... আমি মানস চক্ষে দেখিতেছি, এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া মহামহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে।" (বাণী ও রচনা, খণ্ড ৪, পৃ ঃ ২৬) "মহম্মদের ধর্ম আবির্ভূত হয় জনসাধারণের জন্য বার্তা রূপে। ...তাঁহার বাণী ছিল সাম্য। ...একমাত্র ধর্ম আছে— তাহা প্রেম। জাতি ধর্ম বা অন্য কিছুর প্রশ্ন নাই। এই সাম্যভাবে যোগ দাও। সেই কার্যে পরিণত সাম্যই জয়যুক্ত হইল। ...সেই মহতী বাণী ছিল খুব সহজ সরল... (ওই, পৃঃ ২২৮) । 'মুসলমানের ভারত-অধিকার দরিদ্র পদদলিতের উদ্ধারের কারণ হইয়াছিল। এই জন্যই আমাদের এক-পঞ্চমাংশ ভারতবাসী মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। কেবল তরবারির বলে ইহা সাধিত হয় নাই। নিছক তরবারি ও বন্দুকের বলে ইহা হইয়াছিল মনে করা নিতান্ত পাগলামি।" (ওই, পৃঃ ৩৯৫)।

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, "মুসলমান অভিযানকারীরা এশিয়াকে প্লাবিত করে ইউরোপকে অধিকার করতে উদ্যত হয়েছিল। স্পেনকে জয় করে তারা সেখানে বিরাট বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিল। সেখানে তখনকার পরিচিত পৃথিবীর সকল স্থান থেকে পণ্ডিতেরা আকৃষ্ট হয়ে এসেছিলেন। ভারতের প্রজ্ঞা, প্রাচ্যের জ্ঞানসম্পদের সঙ্গে এখানে পরিচয় সাধন করানো হত। দৈনন্দিন জীবনে শালীনতা, পরিমার্জনা ও সহবৎ তারা এনেছিল। পিছনে রেখে গিয়েছিল অতুলনীয় সৌন্দর্যময় সারসৈনিক স্থাপত্য, তৎসহ বিদ্যার ঐতিহ্য এবং প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের জ্ঞান ও সংস্কৃতির যথেষ্ট উপাদান।" (স্বামীজীকে যেমন দেখিয়াছি—নিবেদিতা, পৃঃ ২৪৯)

বিবেকানন্দ আরও বলেছেন, "অতীতে যত ধর্ম সম্প্রদায় ছিল, আমি সবগুলিই সত্য বলিয়া মানি এবং তাহাদের সকলের সহিতই উপাসনায় যোগদান করি।...আমি মুসলমানদিগের মসজিদে যাইব, খ্রিস্টানদের গির্জায় প্রবেশ করিয়া ক্রুশবিদ্ধ ঈশার সম্মুখে নতজানু হইব, বৌদ্ধদিগের বিহারে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধের ও তাহার ধর্মের শরণ লইব ..."। (স্বামীজীর বাণী ও রচনা, খণ্ড-৩, পৃঃ ১৪০) বিবেকানন্দের এই চিন্তার সাথে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের চিন্তার মিল কোথায়? তিনি তো দাঁড়িয়ে আছেন একেবারে বিপরীত মেরুতে! বিবেকানন্দ যখন উদারতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার কথা প্রচার করছেন তখন দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রচার করছেন ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির— যার পরিণতি দাঙ্গা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, লুঠতরাজ, হত্যা— মানবেতর সবকিছু। দীনদয়ালজিরা যে বিষবৃক্ষ রোপণ করে গেছেন তা এখন মহীরুহের আকার ধারণ করেছে।

২০০২ সালের গুজরাট গণহত্যার যে বীভৎসতা ভারত দেখেছে তা কি কোনও মানুষের কাজ হতে পারে? দীনদয়ালজির সংগঠন আরএসএস এবং তাঁর সৃষ্ট হিন্দু মহাসভার বর্তমান রূপ বিজেপি এই গণহত্যার হোতা। বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মের নামে এই পৈশাচিক গণহত্যা কখনও সমর্থন করতে পারতেন?

ভারতের নবজাগরণের শিক্ষা ও চিন্তার বিরোধিতা করেছেন দীনদয়ালজিরা

ভারতের নবজাগরণের যাঁরা প্রাণপুরুষ তাঁরা যথার্থ বলেছিলেন, নতুন সমাজ গড়ে তোলার জন্য নতুন মানুষ দরকার। এই মানুষকে পুরনো সংস্কার ও ও কূপমণ্ডুকতা থেকে মুক্ত হতে হবে। নতুন ও উন্নত চিন্তার ভিত্তিতে নিজের মননকে গড়ে তুলতে হবে। এই জন্য দরকার 'ইউরোপীয় আকর থেকে জ্ঞানবিদ্যা সংগ্রহ করা'। এবং তা সম্ভব যদি ইংরেজি ভাষায় নিজেদের সুশিক্ষিত করা যায়। নিজে সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। কিন্তু তিনি ইংরেজি ভাষা শিক্ষার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর বলেছেন, "সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজি সাহিত্যের সাথে পরিচিত করানো হয়, তা হলেই তারা বাংলা সাহিত্যের সর্বোত্তম ও যোগ্যতম স্রষ্টা বলে প্রমাণিত হবেন " (নোটস অন সংস্কৃত কলেজ, এপ্রিল-১২, ১৮৫২)। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গা-যমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে, কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে " (রচনাবলি, ১১ খণ্ড, পৃ ঃ ৬৪৩)।

কিন্তু পণ্ডিত দীনদয়াল হেঁটেছেন একেবারে উল্টোপথে। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেননি, লড়াই করেছেন ইংরেজি ভাষার বিরুদ্ধে। বুক ফুলিয়ে বলেছেন, "ইংরেজি ভাষা তাড়াতে পারলে আমাদের জাতীয় মর্যাদা রক্ষিত হবে।" বলেছেন, "যদি ইংরেজি ভাষা থেকে যায়, তা হলে কোনও ভারতীয় ভাষাই বিকশিত হবে না।" ব্যাপারটা বুঝুন, ভাষা বিকাশের বিজ্ঞানের তিনি কোনও তোয়াক্কাই করলেন না, ইংরেজি বিদায়ের সাথে সাথে তো বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ প্রায় ছিন্ন হয়ে যাবে, আর তার ফলে তো ভারতীয় ভাষাগুলোর বিকাশ এবং সেই অর্থে হিন্দি ভাষা বিকাশের প্রক্রিয়াও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে! তা হলে? দীনদয়ালজির কথা হল, বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয় হোক, কিন্তু ইংরেজি ভাষাকে তাড়াতে হবে। চমকে উঠবেন না, দীনদয়ালজি সত্যিই এমন কথা বলেছেন তাঁর ভাষায়, "ইভেন অ্যাট দ্য রিস্ক অফ লুজিং অ্যাক্সেস টু মডার্ন সায়েন্টিফিক নলেজ, উই শুড ফ্রি আওয়ারসেলভস ফ্রম দ্য ক্লাচেস অফ দিজ ফরেন টাং।" অর্থাৎ, আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে সংযোগ হারানোর বিপদ থাকলেও এই বিদেশি ভাষার খপ্পর থেকে আমাদের নিজেদের মুক্ত করা উচিত। (উপরের উদ্ধৃতিগুলো সুধাকর রাজে সম্পাদিত 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, এ প্রোফাইল' গ্রন্থ থেকে গৃহীত)। কোথাও অস্পষ্টতা নেই। নাই বা রইল বিজ্ঞান, নাই বা রইল আধুনিক জ্ঞান— সনাতন ধর্ম থাকবে তো!' রাম নাম সত্য হ্যায়' বলতে বলতে কিশোরী বধূকে স্বামীর সাথে চিতায় তুলে পুড়িয়ে মারা যাবে তো! এ হলেই তো চলে যাবে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ঝামেলার দরকার কী?

দীনদয়ালজীরা এইভাবে অন্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিন্তু উগ্র ও যুক্তিহীন এক প্রজাতি সৃষ্টির নিদান দিয়ে গেছেন। ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ এখন এই নিদান আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করছে। এই পুঁজিবাদ সংকটগ্রস্ত— সংকট তার ভিতরে, বাইরে, সর্বত্র। সংকট তার অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, সংকট তার জীবনবোধে। সভ্যতাকে সে আর কিছু দিতে পারে না, দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই। মানুষের চরিত্র হনন করেই তার টিকে থাকার চেষ্টা। তাই মহান মনীষীদের সে ভুলিয়ে দিতে চায়, আবার এমন মানুষদের সে সামনে আনতে চায় যারা সভ্যতা হননের কাজে তার সহযোগী হতে পারবে। দীনদয়ালজির 'মহামানব' ভাবমূর্তি গড়ে তোলার চেষ্টার মধ্য দিয়ে বিজেপি ভারতীয় পুঁজিবাদের সেই আকাঙ্ক্ষাকেই বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই চেষ্টা ভারতের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ সফল হতে দিতে পারে না।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালিত

২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস হিসাবে পালিত হয়। ১৯৮৬ সালের এই দিনটিতে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী সি ভি রমন তাঁর বিখ্যাত 'রমন এফেক্ট' তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তারপর থেকে ভারতে এই দিনটি 'জাতীয় বিজ্ঞান দিবস' হিসাবে পালন করে আসছেন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। উদ্দেশ্য, জনমানসে বিজ্ঞান চেতনার সম্প্রসারণ।

এমনিতেই আমাদের দেশ ভারতে ঐতিহাসিক কারণে যুক্তিবাদের চর্চা বেশি দূর এগোয়নি। অজ্ঞ নিরক্ষরদের বাদ দিলেও সমাজে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরাও নানা ধরনের অর্থহীন সংস্কার, গোঁড়ামি এবং অন্ধবিশ্বাসের শিকার। একদল যাঁরা যুক্তিবাদকে মূল্য দেন, তাঁরাও বহু ক্ষেত্রে বিজ্ঞানমনস্কতাকে পুরোপুরি রক্ষা করতে পারেন না। এই সমাজ মানসিকতাই বিভেদের বিষবৃক্ষ বেড়ে ওঠার উর্বরভূমি। আজ দেশ জুড়ে শাসক শ্রেণির দ্বারা যুক্তিবাদের উপর যে আক্রমণ হচ্ছে, অন্ধ বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার পরিণাম ভয়াবহ। এর হাত থেকে নিষ্কৃতি মিলছে না এমনকী বিজ্ঞানেরও।

দেশকে, দেশের জনগণকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার আহ্বানই ব্যক্ত হয়েছে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালনে। সেমিনার, বিতর্কসভা, স্লাইড শো, কুসংস্কার বিরোধী প্রদর্শন, শপথ বাক্য পাঠ, হাতে কলমে বিজ্ঞানের নানা পরীক্ষা-নিরিক্ষা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন পালন করে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস।

শিক্ষার দাবিতে পার্লামেন্ট অভিযান

শিক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েমের প্রতিবাদে এবং ব্যাপক ফি-বৃদ্ধি ও সিলেবাসে সাম্প্রদায়িক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার বিরুদ্ধে এআইডিএসও সহ পাঁচটি বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের যৌথ উদ্যোগে ১৮ ফেব্রুয়ারি হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী পার্লামেন্ট অভিযান করে। রামলীলা ময়দান থেকে মিছিল শুরু হয়ে পার্লামেন্ট স্ট্রিটে পৌঁছালে সেখানে এসএফআই, এআইএসএফ, এআইএসবি, পিএসইউ এবং এআইডিএসও-র নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। এআইডিএসও-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্র, সহসভাপতি কমরেড মুকেশ সেমওয়াল এবং দিল্লি রাজ্য সম্পাদক কমরেড শ্রেয়া সিং কেন্দ্রীয় জনবিরোধী শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি পার্লামেন্ট অভিযান হয় জয়েন্ট ফোরাম ফর মুভমেন্ট অন এডুকেশন (জেএফএমই) এর ডাকে এই বিরাট মিছিলে ছাত্র সংগঠনগুলি ছাড়াও শিক্ষক সংগঠন-কর্মচারী সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও অংশগ্রহণ ছিল। অন্যান্য নেতাদের পাশাপাশি এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষে বক্তব্য রাখেন দলের দিল্লি রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রাণ শর্মা, অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির দিল্লি শাখার পক্ষে অধ্যাপক নরেন্দ্র শর্মা।

রঘুনাথগঞ্জে গ্রামীণ ডাক্তারদের সম্মেলন

১৭ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ হাই স্কুলে পিএমপিএআই রঘুনাথগঞ্জ ১ ও ২ ব্লক প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন চিকিৎসক মাহবুবুর রহমান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠনের রাজ্য সহ সভাপতি ডাঃ রবিউল আলম। জঙ্গীপুর মহকুমার বিশিষ্ট সার্জেন ডাঃ ড্যানিয়েল মোস্তাফি, ডাঃ বিমানকুমার দাস, ডাঃ হেফজুর রহমান, ডাঃ সঞ্জীব চক্রবর্তী সহ তিন শতাধিক গ্রামীণ চিকিৎসক সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেন। সংগঠনের দাবি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কোর্স কারিকুলাম তৈরি করে ৬ মাস থেকে ১২ মাসের রেজিস্টার্ড ডাক্তারদের দিয়ে ট্রেনিং দিতে হবে, কোর্স শেষে সার্টিফিকেট দিতে হবে, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে, গ্রামীণ চিকিৎসক, যাঁরা ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁদের স্বাস্থ্য পরিকল্পনায় যুক্ত করতে হবে, দালাল চক্র বন্ধ করতে হবে, হাসপাতালের বেসরকারিকরণ ও ব্যবসায়ীকরণ বন্ধ করতে হবে, বিনামূল্যে জীবনদায়ী ঔষধ সরবরাহ করতে হবে। প্রধান বক্তা সংগঠনের উপদেষ্টা ডাঃ গৌরাঙ্গ প্রামাণিক গ্রামীণ চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণের বিষয় নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ব্লক হাসপাতালগতভাবে ডেপুটেশন, মিছিল করার ও ১৮ মার্চ কলকাতা নবান্ন অভিযানে দলে দলে যোগদান করার আহ্বান জানান।

মাতৃভাষা উর্দুতে প্রশ্নপত্রের দাবিতে ছাত্রমিছিল

মাতৃভাষায় প্রশ্নপত্রের দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে কলকাতায় মিছিল করল উর্দুভাষী ছাত্রছাত্রীরা। ৫২'এর ভাষা আন্দোলনের শহিদ বেদিতে মাল্যদান ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভার পর রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিলে নেতৃত্ব দেয় 'অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস স্ট্রাগল কমিটি'র ছাত্র নেতৃবৃন্দ। মিছিল শেষে দু'জন প্রতিনিধি মুখ্যমন্ত্রীকে গণস্বাক্ষরিত স্মারকলিপি দিতে নবান্ন যান।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক সৈয়দ হাসান, স্ট্রাগল কমিটির সম্পাদক সামসুল আলম, সহ-সম্পাদক গোলাম ওয়ারিশ, সভাপতি সুব্রত দাস সহ শতাধিক ছাত্রছাত্রী। সামসুল আলম বলেন, "উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজি ভাষার সাথে উর্দু ভাষাতেও প্রশ্নপত্র দিতে হবে। উর্দুমাধ্যম বি এড কলেজ স্থাপন করতে হবে। স্কুলে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। উর্দুতে উন্নত মানের পাঠ্যবই প্রকাশ করতে হবে। কলেজের পরীক্ষায় উর্দু ভাষায় লেখার সুযোগ দিতে হবে। এই ন্যায্য এবং সঙ্গত দাবিগুলির ভিত্তিতে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন চালাচ্ছি। কিছুদিন আগে শিক্ষামন্ত্রীকেও সমস্ত জানিয়ে স্মারকলিপি দিয়েছি। আজ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে দিলাম। সরকার দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে আন্দোলন আরও জোরদার করতে বাধ্য হব।"

ফি-বৃদ্ধির প্রতিবাদে কাশীপুর কলেজে
ডিএসও-র নেতৃত্বে ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ

ছাত্র আন্দোলন ভাঙতে অধ্যক্ষ নামছেন পোস্টার ছিঁড়তে! এমন ঘটনাই ঘটল পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর মহাবিদ্যালয়ে। ছাত্ররা অস্বাভাবিক ফি-বৃদ্ধির প্রতিবাদে পোস্টার লাগিয়েছিলেন।

জেলার কলেজগুলিতে সিবিসিএস সেমেস্টারের নামে চলছে নানা মোড়কে ফি আদায়। ক্লাসে পাখা ঘুরবে, এজন্য দিতে হবে ইলেক্ট্রিক ফি। গরমকালে কলেজে আসবে, অথচ ছাত্ররা 'হুইওয়েদার চার্জ' দেবে না, তা কী করে হয়! উন্নয়নের জন্য ফি দিলেই হবে? ডেভলেপমেন্টের জন্য কি ফি দিতে হবে না? বছরে একবার ফি দিলেই কি হবে? প্রতি সেমেস্টারে দিতে হবে না? এ যেন নবাব-বাদশাদের আমলের মর্জিমাফিক কর আদায়ের ব্যবস্থা!

কলেজগুলির এই ছাত্রশোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে এ আই ডি এস ও। জেলার এ আই ডি এস ও নেতা কমরেড বিকাশরঞ্জন কুমার বলেন, ফি-কমানোর দাবিতে ১৮ ফেব্রুয়ারি অধ্যক্ষের কাছে ছাত্রছাত্রীরা গেলে আচমকা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বহিরাগত নেতারা তাদের আক্রমণ করে। ছাত্রছাত্রীরা তা প্রতিরোধ করে। কলেজের বাইরে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা ডি এস ও-র দুই কর্মীর উপর হামলা চালায়। ক্ষোভে ফেটে পড়ে ছাত্রছাত্রীরা কাশীপুর রাজবাড়ি মোড়ে পথ অপরোধ করে। ১৯ ফেব্রুয়ারি কলেজে পালিত হয় সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট, ছাত্ররা উদ্দীপ্ত প্রতিরোধের স্পৃহায় এ আই ডি এস ও-র আহ্বানে জেলা জুড়ে ধিক্কার দিবস পালন করে।

মদ নিষিদ্ধ করার দাবিতে
১৫ মার্চ
জেলায় জেলায় বিক্ষোভ

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com